দৈনিক খবর

তারিখ ...04 SEP 19...
পৃষ্ঠা... ৫ ... কলাম... ৬-৭

হিংসার রাজনীতিকে হাওয়া দেয়া ঠিক নয়

সন্তোষ গুপ্ত

ঢাকার আলিয়া মাদ্রাসায় ইসলামী ছাত্র শিবিরের সংগে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের সংঘর্ষের পর দেশের বিভিন্ন স্থানে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এ ধরনের সংঘর্ষ ছড়িয়ে পড়ছে। পরিস্থিতির চাপে ২২টি ছাত্র প্রতিষ্ঠান এক মঞ্চে এসে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু একই সংগে ছাত্রলীগ ও জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের মধ্যেও সংঘাত নতুন করে মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে।

আলিয়া মাদ্রাসার ঘটনার পরর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হল থেকে ছাত্র শিবিরের ছাত্রদের বের করে দেয়া হয়েছে কিংবা তারা নিরাপত্তাহীনতার কারণে (কারও কারও মতে) হল ছেড়ে চলে গেছে। ছাত্র শিবিরের পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়েছে, তাদের জোর করে বার করে দেয়া হয়েছে। তাদের কক্ষসমূহ তছনছের ঘটনাটি সত্য। ওদিকে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে বহিরাগতদের সহায়তায় ছাত্র শিবিরের হামলায় আহত ছাত্রদলের সদস্য হাবিবুর রহমান হাসপাতালে মারা যাওয়ার পর উচ্চ পর্যায়ে বিএনপি'র সংগে জামাতে ইসলামীর সমঝোতার চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে।

জামাতে ইসলামী ভীত হয়ে সমঝোতা করতে চায়নি। তারা চেয়েছে একটি কারণে। তাহলো সংঘর্ষের কারণগুলো মৌলিক নয়, কিন্তু বিএনপি'র সংগে তাদের রাজনীতি ক্ষেত্রে অনেক ব্যাপারে মৌলিক মিল আছে। সেই মৌলিক স্বার্থে পরিস্থিতি পয়েন্ট অব নো রিটার্ন–এ না যায় এ নিয়ে তাদের মধ্যে দুশ্চিন্তা আছে। এ দুশ্চিন্তা বিএনপিও করে। না হলে দীর্ঘ এক বছর যাবৎ সাম্প্রদায়িক শক্তির বিরুদ্ধে আন্দোলনে তারা নীরব দর্শক ছিল কেন? সন্ত্রাসকে রোখার নামে সুবিধাবাদী রাজনীতিকে প্রশ্রয় দেয়ার বিরুদ্ধেও হুঁশিয়ার থাকতে হবে।

রাজনীতি ক্ষেত্রে নতুন কোন শক্তি বিন্যাস নয়। কার্যতঃ ছাত্র শিবির–ছাত্রদলের মধ্যে সংঘর্ষকে একটা রাজনৈতিক চাল হিসেবে ব্যবহার করে সাম্প্রদায়িক শক্তির বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনকে তথাকথিত জঙ্গী রূপ দেয়ার মাধ্যমে দেশে একটা নৈরাজ্যকর পরিস্থিতি সৃষ্টির চেষ্টা চলছে।

যখন দু'দল ছাত্রের মধ্যে সংঘর্ষ হয় তখন দু'পক্ষই যেভাবে সশস্ত্র হয়ে লড়াই করে তা সন্ত্রাস দূর করতে সাহায্য না করলেও অপরিহার্য হিসেবে মেনে নিতে হয়। কারণ সশস্ত্র হামলাকারীদের খালি হাতে রোখা যায় না। মুস্কিল বাধে একটা জায়গায়– কারা হামলাকারী ও কারা আত্মরক্ষাকারী এই নিয়ে। এটা হলো ঘটনার টেকনিক্যাল দিক। কিন্তু সশস্ত্র হামলা যারা চালায় প্রথমে তারা নৈতিকভাবে দুর্বল। সুতরাং অনেক ক্ষেত্রে (সব ক্ষেত্রে না হলেও) তাদের মোকাবেলার জন্য ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধই শ্রেষ্ঠ উপায়। সুযোগ বুঝে পাল্টা সশস্ত্র হামলা চালানো প্রতিহিংসার জন্ম দেয় এবং প্রতিরোধের ক্ষেত্রে যে নৈতিক বল হলো মূল কথা, তা শেষ পর্যন্ত বিস্মৃত হয় অনেকে।

শিবিরের সন্ত্রাস হত্যা এবং ক্ষেত্র বিশেষে মেয়েদের লাঞ্ছনার ঘটনা অনেকেই জানেন। তারা হাত কেটে ফেলেছে ছাত্রের এমন নজীর আছে। দেশব্যাপী তার বিরুদ্ধে ধিক্কার বাণী উচ্চারণ করা হয়েছে। কিন্তু সম্প্রতি ক্ষুব্ধ জনতা একজন ছাত্র শিবির কর্মীকে ধরে তার দু'হাত কেটে দিয়েছেন। এই খবরটি পড়ে শিউরে উঠেছি। কেউ বলবেন, শিবিরের সন্ত্রাস সৃষ্টি, হত্যা এবং এ ধরনের ঘটনায় তো শিউরে উঠা উচিত। না, শুধু শিউরে উঠিনি। বার বার বলেছি এর বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হবে। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, শিবিরের কাউকে কোথাও পাওয়া গেলে তার উপর সশস্ত্র হয়ে চড়াও হতে হবে। সবাই জানেন যে, তাদের শক্তির উৎস হলো পেট্রোডলার। তারই সাহায্যে এই হতভাগ্য দরিদ্র দেশে তারা গরীব ছাত্রদের রিক্রুট করছে। যেমন খৃষ্টান মিশনারীরা অর্থ সাহায্য দিয়ে লোককে খৃষ্টান ধর্মে দীক্ষিত করতো এ দেশে একদা। কিন্তু তার পিছনে সহিংসতায় দীক্ষা দেয়ার উদ্দেশ্য ছিল না। এখানে শিবির তাদের '৭১–এর রাজনীতির দীক্ষা দিচ্ছে। তাকে প্রতিরোধ শুধু রাজপথে নয়, তার বিরুদ্ধে সংগ্রামে চাই নৈতিক শক্তি, আত্মিক শক্তি।

বিভিন্ন শিক্ষাঙ্গনে তাদের অনুসারী শিক্ষকরা আজ ছাত্রদের পোশাক–পরিচ্ছদ কিরূপ হবে তা নির্ধারণের চেষ্টা করছেন। কোন কোন স্কুলে তারা ছাত্রদের বাধ্যতামূলকভাবে টুপি ব্যবহার করতে বলেছেন। মনে হবে, এটা তো এমন কিছু নয়। না, টুপি পরলে ক্ষতি নেই। মাদ্রাসার ছাত্ররা সবাই টুপি পরে। এ নিয়ে কথা উঠে না। কারণ, এর মধ্যে কোন উদ্দেশ্য কাজ করে না। প্রথা হিসেবে চলে আসছে। বরং কোন মাদ্রাসার ছাত্র টুপি পরছে না, এটা দেখতে বিসদৃশ্য লাগবে। স্কুলে ছাত্ররা টুপি পরুক আপত্তি নেই। কিন্তু বাধ্যতামূলক করার পেছনে উদ্দেশ্য রয়েছে। সাধারণ শিক্ষাঙ্গনে মানুষকে ধর্মের ভিত্তিতে চিহ্নিত করার প্রয়াস বৃটিশ আমলে দেখা গিয়েছিল ভিন্নভাবে। একদা হিন্দু কলেজে কোন অহিন্দুর ভর্তি হওয়া কঠিন ছিল। প্রেসিডেন্সী কলেজে রূপান্তরিত করার পর সে বাধা উঠিয়ে দেয়া হয়েছে, আমাদের দেশের ইতিহাসে এ ধরনের প্রচেষ্টা ধর্মবোধ বাড়ায়নি। ধর্মান্ধতা বাড়িয়েছে। ঘৃণা ও বিদ্বেষের জন্ম দিয়েছে। যে কোন ছাত্র নিজে স্বেচ্ছায় টুপি পরতে পারে। এসব ক্ষেত্রে বাধ্যবাধকতা আরোপ সুফল দিবে না। তারপর দেখা যাবে একদিন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের মত একদল ছাত্র তৈরী করা হবে– যারা ঠিক করে দিবে বিজ্ঞানের কী বিষয় পড়ানো চলবে এবং চলবে না। স্কুল–কলেজে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান নিষিদ্ধ করা হবে। দোহাই দেয়া হবে অধিকাংশ ছাত্রদের মতামতকে তুলে ধরে। ছাত্রদের ধর্মপ্রবণ ও ধর্মানুরাগী করার পরিবর্তে তাদের মনে ধর্মান্ধতা দেখা দিবে। জামাত–শিবিরের এই চক্রান্তকে উপেক্ষা করে শুধু হিংসাকে হিংসা দিয়ে প্রতিহত করার ধারা দেশকে প্রতিক্রিয়াশীল চক্রের কাম্য গৃহযুদ্ধ তথা নৈরাজ্যের দিকে ঠেলে দিবে।

কাউকে জোর করে মত পরিবর্তন করানো যায় না। তার পরিবর্তে মুক্ত বুদ্ধি, সচেতনতা, প্রকৃত শিক্ষার উপর জোর দিতে হবে। বিক্ষুব্ধ জনতা শিবিরপন্থী ছাত্রের হাত তার কিরিচ দিয়ে কেটে দিয়েছেন। তাদের বিরুদ্ধে এ যাবৎ কার্যকর ব্যবস্থা না নেয়ার জন্য এই হিংসাত্মক ঘটনা ঘটেছে। তাদের যারা প্রচ্ছন্ন মদদ দিয়ে আসছে– এই হিংসাত্মক ঘটনার জন্য তারাও দায়ী।

পরাজিত শত্রু শুধু জামাত–শিবিরের মধ্যে সক্রিয় নয়। যে অন্ধশক্তি আত্মবৈরিতার জন্ম দেয়, সন্ত্রাসের পেছনের শক্তিকে চিহ্নিত করতে ব্যর্থ হয় তাদের বিপর্যয় বারে বারে দেখা দেয়। শিক্ষাঙ্গনে শুধু শিবির সন্ত্রাস সৃষ্টি করছে না। তাহলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদল ও ছাত্রলীগের মধ্যে সংঘাত দেখা দিল কেন? তার সদুত্তর দিতে হবে। এই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গত কয়েক বছর ধরে অস্ত্রের রাজনীতিকে ছাত্ররা রুখেছে সম্মিলিত প্রচেষ্টায়। আবার সেখানে অস্ত্রের ঝংকার শোনা গিয়েছে। ডাকসু'র নির্বাচনের পর এবং আজ যখন রাজপথে সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে মিছিলে ছাত্ররাই অগ্রণী ভূমিকা নিচ্ছে, তখন নতুন করে কারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সন্ত্রাসের উস্কানি দিচ্ছে তাও চিনে নিতে হবে।

সাম্প্রদায়িক শক্তি, গণতন্ত্র বিরোধী শক্তি এবং অস্ত্রের রাজনীতিতে বিশ্বাসী রাজনৈতিক দল যারা ক্ষমতায় গিয়ে রাজনীতি করেন এবং কোনদিন যাদের রাজনীতি অঙ্গনে দেখা যায়নি তারা এখন নানা কাজে অবসর নিয়ে রাজনৈতিক মঞ্চে নেতা হিসেবে আবির্ভূত হচ্ছেন। তারা গণতন্ত্রকে তাদের হুকুম বরদার মনে করেন। ছাত্র সম্প্রদায় এবং রাজনৈতিক দলগুলোকে, যাদের পিছনে আছে আত্মত্যাগের ইতিহাস, দুঃখ জয়ের ইতিহাস, তারা যদি ক্ষুদ্র স্বার্থ ও প্রতারক সময়ের যন্ত্রণা উপেক্ষা করে ঐক্যবদ্ধ হন তবে সন্ত্রাসের শক্তি মাথা নোয়াতে বাধ্য। অস্ত্রশক্তির উপর নির্ভর না করে আত্মশক্তির উপর নির্ভর করাটাই হবে দেশের পক্ষে মঙ্গলকর। গত ১৪ বছরের রাজনীতি থেকে শিক্ষা গ্রহণ করলে দেখা যাবে যে, বিপর্যয় যতবার রাজনীতি থেকে শিক্ষা গ্রহণ করলে দেখা যাবে যে, বিপর্যয় যতবার এসেছে, তা রাজনীতির টেবিলে জুয়ার দান ফেলে জেতার নেশায়।

যে শক্তি মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠিত জাতীয় মূল নীতিগুলোকে অস্বীকার করে তারা কখনই সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে লড়তে পারে না– হোক তারা ডান কিংবা বামের লেবাস পরা তাতে কিছু এসে যায় না। সাময়িকভাবে এর ফলে যেটুকু সুফল এসেছে, তা পরবর্তী আঘাতে– তা বাইরে থেকে আসেনি– নিজেদের মধ্য দিয়ে মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে– সেই আঘাতই বারংবার আমাদের পিছুন হটতে বাধ্য করেছে।

তাই আজ চার মূল শক্তির বিরুদ্ধে যখন ১৯৭৫ সালের খুনীচক্র তাদের প্লাটফরম থেকে কটাক্ষ করে, তার সম্পর্কে আমাদের অনেক রাজনৈতিক দলকে দেখি গণতান্ত্রিক সহিষ্ণুতা অনুসরণ করতে। কিন্তু আজকে চরম অর্থনৈতিক দুর্দশার মুখেও তারা আওয়ামী লীগ আমলের 'দুঃশাসনে' শিহরিত হন। সেদিনের বাজার দর আজকের বাজার দরের তালিকার পরিবর্তে ১৯৭৪ সালের দুর্ভিক্ষের দিনে ৩/৪ দিনের জন্য ১০ টাকা সের চালের দর স্মরণ করে আজও বজ্রকণ্ঠে আওয়াজ তোলেন, আজ দেশে দুর্ভিক্ষ নেই, অপুষ্টির রাজত্ব কোন্ অর্থনীতির কল্যাণে তা নিয়ে কেউ কথা বলেন না।

রাজনৈতিক সন্ত্রাস, উগ্রবাসের আন্দোলন আর বিপ্লবের মোহনীয় মন্ত্র উচ্চারণ করে সেদিন রাজনৈতিক জুয়ার টেবিলে দান রেখে আজ যারা ভিন্ন শিবিরে যোগ দিয়েছে, তাদের বিরুদ্ধে কোন সমালোচনা কেউ করবেন না। এসবই কী গণতন্ত্রের নতুন স্তবক। শুধু জামাত–শিবির বিরোধী শ্লোগান দিয়ে সন্ত্রাস দমন করা যাবে না, তাদের যারা রাজনৈতিক আসরে এনেছে তাদেরও চিহ্নিত করতে হবে।